## তোরা যে যা বলিস ভাই- জোট সরকারের অর্থনীতি কি ডায়াবেটিক!

ডি আর মোহন।।

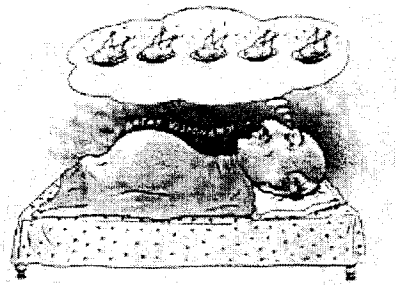

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নানা রোগ-শোকে কাহিল হয়ে পড়ে। আর রোগেরও কোন শেষ নেই। হার্ট, লাং, লিভারের রোগ তো এখন মোটামুটি সাধারণ রোগ। আরেকটি মারাত্মক রোগ আছে যা মানুষকে হঠাৎ মারে না; কিন্তু ধীরে ধীরে শেষ করে। এ ডায়াবেটিস রোগটি একবার যার হয়েছে তার আর মাফ নেই। নিয়মিত জীবনযাপন না করলে তা মানুষকে ভেতর থেকে খেয়ে ফেলে। এমন একটা রোগ দ্বারা কী জোট সরকারের অর্থনীতি আক্রান্ত? অনেক সময় ডায়াবেটিস রোগ যে হয়েছে তা প্রাথমিক অবস্থায় ধরা যায় না। দেখা যায়, একজন সবল-সুস্থ মানুষ দিব্যি ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছেন; কিন্তু হঠাৎ একদিন ধরাশায়ী। তেমনি কি বর্তমান অর্থনীতির অবস্থা দৃশ্যত বোঝা মুস্কিল। মানুষ চলছে, ফিরছে, বাজার করছে, অফিস করছে। কোথাও কোন প্রতিবাদ নেই। চারদিকে স্বাভাবিক একটা অবস্থা। রাস্তাঘাট হচ্ছে, বড় বড় ইমারত হচ্ছে, হচ্ছে সুন্দর সুন্দর ফ্ল্যাট বাড়ি, ঢাকা শহর ছেয়ে যাচ্ছে প্রাইভেট গাড়িতে। হোটেল-মোটেল কোথাও জায়গা নেই। ঈদের ছুটিতে মানুষ ছুটছে কক্সবাজার, টেকনাফ, সেন্টমার্টিন। সর্বোপরি এবার দেখা গেল কোরবানিও হয়েছে বেশ। ভয়েস অফ আমেরিকার সংবাদে শুনলাম এবার গেল বছরের তুলনায় অনেক বেশি পশু কোরবানি হয়েছে। এসব আলামত আমলে নিলে মনে হয় রাজনীতির মতো অর্থনীতিও স্বাভাবিকভাবে চলছে। দৃশ্যত তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কয়েকটি লক্ষণ দেখে সন্দেহ হয়। আর এ লক্ষণগুলো বরাবরই অর্থনীতির স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বলে অর্থনীতিবিদ কর্তৃক চিহ্নিত হয়ে আসছে। লক্ষণগুলো কী? প্রথম লক্ষণ হচ্ছে, ক্রমবর্ধিষ্ণু এবং বিগত ৮ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ মুদ্রাস্ফীতি বা মুল্যস্ফীতির হার। দ্বিতীয় লক্ষণ হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহতভাবে চলা ডলার সঙ্কট। তৃতীয় লক্ষণ হচ্ছে ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে সরকার কর্তৃক ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ গ্রহণ।

মুদ্রাস্ফীতি বা মুল্যস্ফীতির তথ্যটি মারাত্মক। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে গেল বছরের নভেম্বরে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৭ দশমিক ৯ ভাগ। ১৯৯৮-৯৯ সালে প্রবল বন্যার সময়ও মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল এর চেয়ে কম অর্থাৎ ৭ দশমিক ০৬ শতাংশ। এবার বন্যার কোন ব্যাপার নেই। সর্বোপরি নভেম্বর মাস ছিল নতুন ফসল ওঠার মাস। এ সময় খাদ্যশস্যের দাম কম থাকে। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতির হারও কম থাকে। কিন্তু তথ্য বলছে ঠিক উল্টোটি। উল্টো মানে মারাত্মক উল্টো। মুদ্রাস্ফীতির হার গত ৮ বছরের মধ্যে নভেম্বর মাসে ছিল সর্বোচ্চ। আরও মারাত্মক খবর হচ্ছে এ মুদ্রাস্ফীতির হার গ্রামে ছিল বেশি, শহরে কম। মুদ্রাস্ফীতি বা মুল্যস্ফীতিতে ১ টাকার জিনিস মানুষকে ১ টাকার বেশি দিয়ে খেতে হয়। এতে মধ্যবিত্তের সঞ্চয় ও সম্পদ হ্রাস পায়। কারণ তাকে বর্ধিত মুল্য বহন করতে গিয়ে সঞ্চয়ে হাত দিতে হয়। ক্রমাগত মুল্যস্ফীতিতে মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত স্তরে থেমে থাকে। একই প্রক্রিয়ায় নিম্নমধ্যবিত্ত গরিব পর্যায়ে, গরিব আরও গরিব পর্যায়ে এবং হতদরিদ্ররা আরও শোচনীয় পর্যায়ে ছিটকে পড়ে। এতে দেশের সাধারণ মানুষের বিপর্যয় হলেও এনজিও জাতীয় দারিদ্র্য ব্যবসায়ীদের লাভ। বলা বাহুল্য এ কাজটিই আমাদের দেশে হয়ে চলেছে।

বর্তমান মুল্যস্ফীতি বা মুদ্রাস্ফীতির উৎস বেশ কয়েকটি বলে মনে হচ্ছে। একটি তো বরাবরের মতোই আমদানি মুল্য। আমাদের আমদানিযোগ্য প্রায় সব পণ্যের মুল্যই আন্তর্জাতিক বাজারে মাত্রাতিরিক্ত হারে বেড়েছে। বিশেষ করে তেলের মুল্য। এর প্রচণ্ড চাপ পড়েছে অভ্যন্তরীণ বাজার মুল্যে। এদিকে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে আমদানি করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্যাশ ডলার নেই। ব্যাংকগুলো তাদের গ্রাহকদের আমদানি এলসি খুলতে পারছে না ডলারের অভাবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আমদানির ওপর নানা রকমের বাধা নিষেধ আরোপ করেছে। তারপরও দেখা যাচ্ছে, অপ্রয়োজনীয় অথবা ভোগ্যপণ্য নয়, শিল্পপণ্য, আধা শিল্পপণ্য, শিল্পের কাঁচামাল আমদানির জন্য এলসি খোলা যাচ্ছে না। বাজারে ডলারের

অভাব। ফলে ডলারের মুল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে শনৈঃশনৈঃ। ডলারের মুল্য বৃদ্ধি মানেই আমাদের পণ্যের মুল্য বৃদ্ধি। কারণ আমরা বেশির ভাগ জিনিসই আমদানি করে থাকি। বিগত বছর খানেক ধরে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মুল্য মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রতিক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে বেড়েছে অন্যান্য জিনিসের মুল্যও। বর্ধিত মুল্যে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে তেলসহ অন্যান্য পণ্য আমদানি করতে লাগছে অধিক পরিমাণ ডলার। এক তেল আমদানিতেই বারো রকমের সমস্যা হচ্ছে। সরকার পড়ছে লেজে-গোবরে অবস্থায়। খবরে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন সোনালী ব্যাংক থেকে ঋণ করে তেল আমদানি করে। এ তেলের একটি অংশ তারা বিক্রি করে বাংলাদেশ বিমান-এর কাছে। বিমান লোকসানি প্রতিষ্ঠান। তাই তারা পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের টাকা দিতে পারে না। কাজেই পেট্রোলিয়াম করপোরেশনও সোনালী ব্যাংকের টাকা দিতে পারে না। সোনালী ব্যাংকের টাকা আদায় না হওয়ায় এ ব্যাংকটিও আর নতুন এলসি খুলতে পারছে না। অথচ এ ৩টি প্রতিষ্ঠানই সরকারি প্রতিষ্ঠান। ১টির আগুনে আরেকটি জ্বলছে। সরকার এখানে অসহায়। মাঝখান থেকে বিশ্বব্যাংক জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো দাওয়াই দিচ্ছে ব্যাংক বিক্রি করে দিতে। কারণ সোনালী ব্যাংকের ঋণের টাকা আদায় হচ্ছে না, তাই এটি লোকসান দিচ্ছে। কেউ তলিয়ে দেখছে না কার কারণে ব্যাংকটি লোকসান দিচ্ছে।

এদিকে তেল আমদানির বোঝা গিয়ে পড়ছে ব্যালেন্স অফ পেমেন্টে (বিপিও)। প্রচণ্ড চাপ পড়েছে বিওপিতে এটি ডলার সঙ্কটেরই প্রতিফলন। এটি নাও হতে পারত যদি আমরা সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই) বেশি করে পেতাম অথবা পেতাম অধিকতর বৈদেশিক সাহায্য। কিন্তু জোট সরকারের জন্য খারাপ খবর এ দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের অগ্রগতি জোট সরকারের আমলে আশাব্যঞ্জক নয়। প্রকাশিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, ২০০৫ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর অর্থাৎ ৯ মাসে নিট এফডিআই অর্থাৎ নিট ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্টের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৮০ মিলিয়ন ডলার। এদিকে দেখা যাচ্ছে জুলাই-অক্টোবর পিরিয়ডে ৩৮৩ মিলিয়ন ডলার প্রতিশ্রুতির বিপরীতে আমরা বৈদেশিক সাহায্য পেয়েছি মাত্র ১৯৯ মিলিয়ন ডলার। কম সাহায্য প্রাপ্তির সঙ্গেই আবার জড়িত আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচি (এনুয়েল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম)। তথ্যে দেখা যাচ্ছে ২০০৫-০৬ আর্থিক সালের প্রথম ৪ মাসে এডিপি বাস্তবায়নের হার মাত্র ১৫ শতাংশ। অথচ এ হার গেল বছরের একই সময় ছিল ২১ শতাংশ। বলাবাহুল্য শুধু বাস্তবায়ন ক্ষমতা আমাদের কম হওয়ার কারণেই এটি ঘটছে না, ঘটছে তহবিল সঙ্কটের কারণেও। সরকারের রাজস্ব ঘাটতি প্রকট। বিদেশী সাহায্যের ফ্লোও কম। উভয় কারণেই এডিপি বাস্তবায়নের গতি খুবই মন্থর।

তথ্যে দেখা যাচ্ছে, সরকার তার রাজস্ব ঘাটতি মেটাতে গিয়ে ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছে। শুধু ব্যাংক থেকে নয় সরকার সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমেও ঋণ নিচ্ছে। সর্বশেষ তথ্য আমার কাছে নেই। তবে মনে হচ্ছে সঞ্চয়পত্র কেনা-বেচার মাধ্যমে সরকার আশানুরূপ ঋণ পাচ্ছে না যদিও এক্ষেত্রে অনেক নিয়মাবলি শিথিল করা হয়েছে। পরিমাণগত উর্ধ্বসীমা বাড়ানো হয়েছে, সঞ্চয়পত্রের ওপর সুদের হার বাড়ানো হয়েছে, সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষ ধরনের সঞ্চয়পত্র চালু করা হয়েছে যার ওপর আবার সুদের হার বেশি। এতসব করারও পরও মনে হয় মানুষ আগের মতো হুমড়ি খেয়ে সঞ্চয়পত্রের দিকে ধাবিত হচ্ছে না। এখন তার কাছে বিকল্প আছে। এমতাবস্থায় সরকার ঝুঁকেছে ব্যাংক ঋণের দিকে। এর ফলে বেসরকারি খাতের ব্যবসায়ীরা প্রয়োজন মতো ঋণ পাচ্ছে না। অথচ সরকারই দাবি করছে বেসরকারি খাতে একটা বুম শুরু হয়েছে যদি তাই হয় তাহলে এ বুম ধরে রাখার জন্য বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ বাড়ানো দরকার। কিন্তু বিপরীতে দেখা যাচ্ছে, বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ সঙ্কোচন করা হচ্ছে। আর সিংহভাগ ব্যাংক ঋণ নিয়ে নিচ্ছে সরকার। ব্যাংক থেকে সরকার ঋণ নিয়ে নিলে সাধারণভাবে মুদ্রাস্ফীতি হওয়ার কথা নয়। কারণ এ টাকা এরই মধ্যে বাজারে আছে। নতুন নোট না ছেড়ে বাজারের টাকা থেকেই সরকার ঋণ নিলে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা কম। কিন্তু তা কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে নিলে বিপদ। কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ মানেই নতুন নোট বাজারে আসা। মনে হচ্ছে সরকার তাই করছে। প্রকাশিত খবর থেকে দেখা যাচ্ছে বিগত ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সরকার ব্যাংকিং খাত থেকে ৪ হাজার ৩৬৮ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। এর মধ্যে ৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকাই নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে। বলাবাহুল্য ৪ হাজার ৩৬৮ কোটি টাকার মধ্যে যে ৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ হিসাবে নেয়া হয়েছে তার প্রভাবই সরাসরি পড়ছে মুদ্রাস্ফীতিতে। এর আলামতই কি অর্থনীতিতে ক্যাশ সরবরাহ (কারেন্সি আউটসাইড ব্যাংকস) বৃদ্ধি? কারেন্সি আউট সাইড ব্যাংকস গত জুলাই মাসে ছিল ১৮ হাজার ৮৬৮ কোটি টাকা। আগস্ট মাসে তা সামান্য (৩২ কোটি) হ্রাস পায়। সেপ্টেম্বরে অবশ্য এর পরিমাণ ৫১৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। অক্টোবরে এসে কারেন্সি আউটসাইড ব্যাংকস এক লাফ দিয়ে ২ হাজার ৩৩৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি

পায়। এ মাসে কারেন্সি আউটসাইড ব্যাংকস-এর পরিমাণ দাঁড়ায় ২১ হাজার ৬৮৫ কোটি টাকা। বহু কষ্টে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি পাবলিকেশন জোগাড় করে বুঝলাম কারেন্সি আউটসাইড ব্যাংকস মানে কি। সহজ কথায় একটি নির্দিষ্ট দিনে মানুষের হাতে অর্থাৎ বাজারে যে নগদ টাকা থাকে তাই হচ্ছে কারেন্সি আউটসাইড ব্যাংকস। বাজারে নগদ টাকা সব সময় এক থাকে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তা নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণভাবে বলা যায়, এর বৃদ্ধি ঘটে ৩টি কারণে। জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি ও মানিটাইজেশন-এর কারণে বাজারে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি করতে হয় যাতে মানুষ তার লেনদেন চাহিদা মেটাতে পারে। এটি করতে গিয়ে যদি মাত্রাতিরিক্ত হারে তা করা হয় তাহলেই নিয়ন্ত্রণহীন মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।

লক্ষণীয় আমাদের দেশে ১৯৯৮-৯৯ সাল থেকে ২০০৪-০৫ এর মধ্যে বাজার মুল্যে জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৬৭ শতাংশ। কিন্তু বাজারে নগদ টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ২১৩ শতাংশ। এ বৃদ্ধি কি সামগ্রিক বিচারে সঙ্গতিপুর্ণ? আমার মনে হয় তা সম্পূর্ণ সঙ্গতিপুর্ণ নয়। যদি তাই হয় তাহলে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উচিত তার কারণগুলো তলিয়ে দেখা।

নিবরে শুরুতে মুদ্রাস্ফীতি, ডলার সঙ্কট ও সরকারি খাতে ঋণ বৃদ্ধি এ যে ৩টি অর্থনৈতিক খারাপ লক্ষণের কথা উল্লেখ করেছিলাম দেখা যাচ্ছে, এ লক্ষণগুলো প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক গভীর সঙ্কটের লক্ষণ। এ সঙ্ক ট মোকাবেলার জন্য যে দৃঢ় পদক্ষেপ দরকার ছিল তা গ্রহণ করতে সম্ভবত জোট সরকার আগ্রহী নয়। এটি তাদের আমলের শেষ অর্থবছর এবং সামনে নির্বাচন। জনপ্রিয়তা, ভোট নির্বাচন ইত্যাদি মাথায় রেখে সরকার এখন বিভোর খরচে। এতে যে রাজস্ব ঘাটতি ক্রমেই বাড়ছে সে কথা আগেই বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য এ ঘাটতি মেটাতে গিয়েই সরকারি খাতে ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতেই প্রধানত বিপত্তি ঘটছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে একশ্রেণীর ব্যবসায়ীর সীমাহীন লোভ। এ ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে পণ্যের মুল্য বাড়িয়ে বাজার থেকে দ্রুত শত শত কোটি টাকা লুট করে নিয়ে নিচ্ছে। এ লোভ প্রতিরোধে সবদেশে সরকারই থাকে একমাত্র ভরসা; কিন্তু সরকার এদের সহযোগী হলে মানুষের বাঁচার আর কোন পথ খোলা থাকে না। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি বাংলাদেশে সিন্ডিকেটওয়ালারাই সরকারের শক্তি।

http://www.thedailysangbad.com